সংবাদ

তারিখ 29 JUN 2009
পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন-২

ম. আখতারুজ্জামান

আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী মাদ্রাসা, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান কেন আশাপ্রদ নয় তার কারণগুলো বিশ্লেষণ না করে মানোন্নয়ন প্রচেষ্টা নির্ঘাত ব্যর্থ হবে। কোন একটি প্রবন্ধে বা সেমিনারে তা পুরোপুরি বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তাই এখানে খুব সংক্ষেপে কিছু বিষয় উল্লেখ করছি।

মাদ্রাসা

আলোচনার শুরুতেই মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে দুটো তথ্য দিতে চাই। প্রথমত, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এর বৃদ্ধি হচ্ছে সর্বোচ্চ। ১৯৭৪ সালে ১৯৭৪টি মাদ্রাসা ছিল। ২০০৩ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৩০.০৪টিতে (বার্ষিক বৃদ্ধি হার ২৯%)। দ্বিতীয়ত, ২০০২-০৩ সালে ছাত্রপ্রতি বার্ষিক ব্যয় ছিল সরকারী বিদ্যালয়ের (টাকা ৪৫৫১) তুলনায় মাদ্রাসায় ব্যয় ছিল বেশি (টাকা ৫০৮৪)। বেসরকারি মাদ্রাসার বৃদ্ধি হয়েছে আরও অনেক বেশি।

মাওলানা হোসেন আলী (২০০১) *বাঙালী মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সন্ধানে* পুস্তকে এবং মুফতি এনায়েতুল্লাহকে নিয়ে আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে দৈনিক সমকালে ২০০৬ সালের এপ্রিল থেকে বেশ কয়েক মাস ধরে প্রতিসপ্তাহে এক দিন বেশ কিছু প্রবন্ধ, আলোচনা, সাক্ষাৎকার, মতামত প্রভৃতি প্রকাশ করেন। এসব লেখায় আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষার হালচাল বেশ ভালভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁদের মতে, মোল্লা নিজামুদ্দিন (জন্ম ১৬৭৭-৭৮ মৃত্যু ১৭৪৮ খ্রি.) *দরসে নিজামী তথা কওমী মাদ্রাসা-র* শিক্ষা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা। সামান্য পরিবর্তনসহ এ পদ্ধতির সিলেবাসই কওমী মাদ্রাসায় চালু আছে। আড়াই শ' বছরের বেশি সময় ধরে এ শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হচ্ছে। শিক্ষার মাধ্যম উর্দু, আরবী, ফার্সি। *কামিল মাদ্রাসা*-র দশা একই -'আজ থেকে শত শত বছর আগের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যেসব গ্রন্থ অধ্যয়ন করে শিক্ষাঙ্গন থেকে বের হতেন আজকেও তা করতে হয়'। সব চেয়ে মারাত্মক কথা হলো, 'কামিল শ্রেণী পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষা মুখস্থ-সর্বস্ব এবং প্রায়ই নকল নির্ভর (সমকাল ২১-৬-০৬)। 'ময়না পাখির মতো বুলি কপচানোর মধ্যে এ শিক্ষা অনেকখানি সীমাবদ্ধ।' ভারত ও পাকিস্তানেও পরিস্থিতি প্রায় একই রকম (1. Amir U. Khan *et al.* Madrassah in India Pakistan : Past, Present and Future, 2. Salim S. Ali. 2005. Madrassah in Pakistan. 6. Salim S. Ali. 2006. Curriculum in Darse-Nizami).

অতি সংক্ষিপ্ত এ আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত আড়াই শত বছরে বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বিশাল অগ্রগতি হয়েছে, তা থেকে আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত। এক সময় ছিল যখন খ্রিস্টান চার্চ দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও আমাদের মাদ্রাসার মতো রক্ষণশীল ছিল। এখন সারা বিশ্বে পাদ্রিদের পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও এ কথাটি আমি বলতে পারি। আমি বিশ্বের সেরা ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকার নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছি। সেখানে প্রতি তত্ত্বীয় ক্লাসের শুরুতে, শুধু খ্রিস্টানরা, ১২টি শব্দের একটি ছোট প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করত। বাকি সব পঠন-পাঠন, সব কিছু ছিল পুরোপুরি সেক্যুলার। এতদিনে আরও উন্নতি হয়েছে। এখন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরাও পড়তে পারে। প্রোটেস্ট্যান্ট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তো বটেই, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সব ক্যাথলিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিবর্তনবিদ্যা, মানব বিবর্তন পড়ানো হয়। নটর ডেমে এ বিষয়ে অনেক উঁচু মানের গবেষণাও করা হয়।

অতীতে মাদ্রাসাগুলো ছিল সেক্যুলার এবং এখনও অনেক দেশে তা আছে। আমাদের মাদ্রাসাগুলো যতদিন সেক্যুলার ও কো-এডুকেশনাল না হবে, যতদিন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা না করা হবে, ততদিন এগুলো [illegible] উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে না। অবশ্য ধর্মীয় জ্ঞানচর্চার যথেষ্ট সুযোগ রেখেই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থাৎ সেক্যুলার বিষয়গুলো সর্বস্তরে মাদ্রাসাতে গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে মাদ্রাসাগামী দেশের মূলত গরিব মানুষের সন্তানেরা আধুনিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের দেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিছু সংখ্যক ধনী বা সচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যা বুঝায় এগুলোকে তা বলা চলে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। কারণ এগুলোতে অতি সীমিত সংখ্যক বিষয় পড়ানো হয়। দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এগুলো একটু বড়সড় কোচিং সেন্টার। এগুলোর মূল লক্ষ্য মুনাফা। অথচ দুনিয়ার সবদেশে বিশ্ববিদ্যালয়কে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনেও তা লেখা থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আইনে তা লেখা নেই। এর সুযোগ নিয়েছে এসব বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু মুনাফা করা নয়, সার্টিফিকেট বিক্রির অভিযোগও উঠেছে কোন কোনটির বিরুদ্ধে।

২০০৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি' গঠন করা হয়। তখন ক্ষমতায় বিএনপি'র নেতৃত্বে চারদলীয় জোট। এ জোট সরকারই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গগনচুম্বি বৃদ্ধির জন্য দায়ী। আর উল্লিখিত পুরো কমিটি ছিল এ জোটের আস্থাভাজন লোকদের নিয়ে গঠিত। এ কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছে, তা থেকেও আমাদের উক্ত পর্যবেক্ষণ সমর্থিত হয়। নিম্নে এ প্রতিবেদন থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

১. ...অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে নতুন কোর্স, বিভাগ, এমনকি অনুষদও চালু করেছে।' (পৃ. ৪)।

২. 'এমনকি, কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি নিয়ে আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনৈতিকভাবে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য প্ররোচনা চালাচ্ছে।' (ঐ)।

৩. 'প্রায় সব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ভাড়াকরা বাড়ি/ভবনে বা বাণিজ্যিক ভবনের ২/১টি ফ্লোরে স্থাপিত... ফলে ছাত্রছাত্রীদের চলাফেরা করা কঠিন।' (ঐ)।

৪. '...ফলে বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার্থীরা যথাযথ ব্যবহারিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে' (পৃ. ৫)।

৫. 'উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়-ব্যয় হিসাব ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় না।' (ঐ)।

৬. মানসম্মত শিক্ষার অভাব : বিশ্ববিদ্যালয় অবাধ, মুক্তবুদ্ধি এবং নিরপেক্ষ জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রস্থল। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশের উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সঙ্কটময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ...নিয়ম অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য ও অভিজ্ঞ পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ না করে অধিক সংখ্যক সবে মাত্র পাস করা জুনিয়র শিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।' (পৃ. ৯)।

৭. 'ছাত্র বেতন/টিউশন ফি প্রতি ক্রেডিট সর্বনিম্ন ২০০ থেকে সর্বোচ্চ ৭৫০০/-টাকা পর্যন্ত আছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিরিখে ছাত্রবেতন/টিউশন ফি নির্ধারণ করা উচিত।' (পৃ. ৬)। উল্লেখ্য, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০০ সালে এমবিএ ও বিবিএ ডিগ্রি করতে একজন ছাত্রের লেগেছে যথাক্রমে টাকা ৩,১২,০০০ (প্রতি ক্রেডিট ৫০০০ টাকা, মোট ৬০ ক্রেডিট) ও টা. ৪,৫৮,৮৭৬ (প্রতি ক্রেডিট ৩,৫৭৫, মোট ১২০ ক্রেডিট (Mahmudul Alam *et al.* 2007. Private Higher Education in Bangladesh)।

৮. 'যে শিক্ষক দ্বারা পাঠদান করা হয় সেই শিক্ষকই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন এবং উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করে থাকেন।' (পৃ. ১০)।

৯. অস্বচ্ছ পরীক্ষা পদ্ধতি : অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাসের সম্পূর্ণ শেষ না করে পরীক্ষা নিচ্ছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণকালীন শিক্ষকের পরিবর্তে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করে নির্ধারিত ক্রেডিটের স্থলে ক্রেডিট আওয়ার কমিয়ে নামমাত্র পরীক্ষা নিয়ে কোর্স শেষ করছে। ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি ও পরীক্ষার গ্রেডিং প্রদানে স্বচ্ছতা নেই। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক নম্বর দিচ্ছে বলে পাবলিক ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলে বৈষম্য দেখা যাচ্ছে। ফলে নানা জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞানের উন্মেষ সাধন ব্যাহত হচ্ছে।' (পৃ. ১১)

১০. 'অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্যোক্তারাই প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছেন। তারা নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে সবকিছু সীমাবদ্ধ রেখে অনেক জটিলতার সৃষ্টি করেছেন।' (পৃ. ১২)

১১. 'বিশ্ববিদ্যালয় অলাভজনক প্রতিষ্ঠান (non-profit organization)। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাগণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থ উন্নয়নমূলক কাজে না ব্যয় করে তারা ব্যক্তিস্বার্থে তা ব্যবহার করছেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরাসরি কোন পারিশ্রমিক না নিলেও পরোক্ষভাবে প্রতি মিটিং-এ ৫০০০ থেকে ১০০০০ টাকা পর্যন্ত সিটিং এলাউন্স বাবদ নিয়ে থাকেন। এমনও তথ্য পাওয়া গেছে যে, সপ্তাহে ৩/৪টি ঐ ধরনের মিটিং করেন। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্যোক্তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থে ব্যয়বহুল যানবাহন কিনে ব্যবহার করা এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নয় এমন কাজে অপ্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করার অভিযোগও পাওয়া গেছে।...নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় হিসাব ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় না। ফলে আর্থিক অনিয়ম প্রকটভাবে বিদ্যমান।' (পৃ. ১৩)

...বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব অনিয়ম দূর করার জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। এ আইনটি যত দ্রুত সম্ভব পার্লামেন্টে পাস করে বাস্তবায়ন করা দরকার।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ৬৮১.০৪ কোটি টাকার একটি পঞ্চবার্ষিক (২০০৯-২০১৩) *উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প* গ্রহণ করেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এত কিছু জানা সত্ত্বেও কি কারণে মঞ্জুরি কমিশন ও সরকার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে এ প্রকল্পের আওতায় সাহায্য পাবার উপযোগী মনে করেছে, তা আমাদের জানা নেই। মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম ১৪ মে, ২০০৯ তারিখে ঢাকার একটি হোটেলে প্রকল্পটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলেছেন যে কিছু শর্ত পূরণ না করতে পারলে এ সাহায্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পাবে না। তার মতে, এ কারণে দুই একটির বেশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হয়ত এ সাহায্য পাবে না। কিন্তু আমাদের কথা হলো নীতিগত। যত দিন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ব্যক্তি মুনাফার উৎস ও উপকরণ হয়ে থাকবে, তত দিন এরূপ সরকারি সাহায্য পেতে পারে কিনা। কারণ, বিশ্ব ব্যাংকের এ টাকা অনুদান নয়, 'সাহায্য'। এ টাকা দেশের মানুষকেই পরিশোধ করতে হবে। আর যাদের টাকায় এ ঋণ পরিশোধ করা হবে, সে জনগণের অধিকাংশ হল গরিব মানুষ, যাদের সন্তানেরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাবে না। অথচ তারাই ঋণের সিংহ ভাগ পরিশোধ করবে। সুতরাং, আমাদের প্রস্তাব, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে এ প্রকল্পের আওতায় না রাখা। (ক্রমশ:)

[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস) এবং বিশ্ব শিক্ষক ফেডারেশন (FISE-WFTU).]